International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 90-93
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 14-03-2026
Accepted: 25-03-2026
Publish : 26-03-2026

Basudeb Halder
Former Student,
Dept. of Bengali,
University of Kalyani,
West Bengal, India

Correspondence:
Basudeb Halder
Former Student,
Dept. of Bengali,
University of Kalyani,
West Bengal, India

বাংলার লোকগান

(Folk Song in Bengali)

Basudeb Halder

Abstract — লোকগান হল মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, অনুভূতি ও ঐতিহ্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এগুলো সাধারণত গ্রামীণ সমাজে মুখে মুখে প্রচলিত হয় এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের ভাষায় রচিত, তাই সহজে বোঝা যায়। এই গান মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, এর লিখিত নিদর্শন বিরল। প্রেম, দুঃখ, সুখ, কৃষিকাজ প্রকৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি অবলম্বনে লোকসঙ্গীত রচিত। এই গানের সহজ সুর ও তাল ব্যবহার করা হয়, যাতে সবাই গাইতে পারে। অধিকাংশ লোকগানের নির্দিষ্ট কোনো রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। লোকসঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পর্যায় রয়েছে — ভাটিয়ালি, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাদু, টুসু, ঝুমুর, কবিগান, যাত্রাগান, বোলান, ঝাপান, ঝুমুর প্রভৃতি। কোনো গান আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবধারার হয়ে থাকে, কোনো গান নৌকার মাঝি মাল্লার গান, আবার কোনো গান গ্রামীণ সমাজের ধর্মীয় সংস্কারের সমবেত সঙ্গীত। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সরল চিত্র এই সমস্ত গানে প্রকাশিত। লোকগান একটি জাতির সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই গানে আমাদের ইতিহাস, সমাজ, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার লোকগানের মাধ্যমে আমরা আমাদের শেকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারি।

Keywords — লোকসঙ্গীত, লোকসঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগ, বাউল, বাংলার সমাজ জীবন, বাঙালির সংস্কৃতি।

ভূমিকা — গীতিপ্রিয়তা বাঙালির সহজাত এক প্রবৃত্তি। সেই প্রাচীনকাল থেকে আমরা গানের পূজা করে চলেছি। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’-এর মধুর গীতিগুলিতে বাঙালি মানসে সেই স্বাক্ষর মেলে। বাংলা ভাষায় লেখা ‘চর্যাপদ’ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সাহিত্যে, এমনকি একবিংশ শতকের যন্ত্রনির্ভর যুগে উপনীত হয়েও আজও বাঙালির হৃদয়ে সঞ্চরণশীল গীতিময় ধারা। তবে আধুনিক যুগে পদার্পণ করে সঙ্গীতের ধারাতে এসেছে বিবর্তন। শিষ্ট সমাজ ও লোকসমাজ এই দুটি ভাগে সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। শিষ্ট সমাজে সৃষ্ট সঙ্গীত হল শিষ্ট সঙ্গীত। যা কোনও একজন ব্যক্তিমানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এবং লোকসমাজে কর্তৃক মৌখিকভাবে প্রচারিত সঙ্গীতই হল লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতে সাধারণত একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করে গীত হয়। শিষ্ট সঙ্গীতের মতো এই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, লোকসঙ্গীতের প্রত্নপ্রতিমার ওপর স্থাপিত শিষ্টসঙ্গীতের ভিত্তি। লোকসঙ্গীত গ্রাম ও শহরের অশিক্ষিত বা নিরক্ষর জনসাধারণের মুখে মুখে রচিত গান। কর্মব্যস্ত মানুষের জীবনে লোকসঙ্গীত এক উপাদেয় বিষয়। নৌকা বাওয়া, মাঠে চাষ করা, গাড়ি চালানো — প্রভৃতি কাজের মাঝে মানুষের মুখে গুনগুনিয়ে ওঠে এই গান। এভাবেই অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের মুখে মুখে লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য — লোকসঙ্গীত বা লোকগান মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এটি কোনো নির্দিষ্ট স্রষ্টার ওপর সীমাবদ্ধ নয়; বরং যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে গড়ে ওঠে এবং পরিবর্তিত হয়। গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ প্রভৃতি ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক সম্পর্ক সবকিছুই লোকসঙ্গীতে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। লোকগানের প্রতিটি ধারায় রয়েছে তার নিজস্ব উপাখ্যান এবং তার প্রচলন রূপ। বাংলার এই জনপ্রিয় কাহিনীসমৃদ্ধ লোকগানের ধারাগুলি পাঠকের সামনে মেলে ধরা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আধুনিক যুগে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও নগরায়নের ফলে লোকসঙ্গীত কিছুটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও এর গুরুত্ব ও আবেদন এখনও অমলিন। বরং বিভিন্ন গবেষণা, সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এবং আধুনিক সঙ্গীতের সাথে মিশ্রণের ফলে লোকসঙ্গীত নতুনভাবে পরিচিতি পাচ্ছে। এর ফলে আধুনিক পাঠক বা শ্রোতার কাছে এই গান আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে বলে ধারণা।

উৎপত্তি ও ইতিহাস : Folk শব্দটি এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Folc থেকে, যার অর্থ 'সাধারণ মানুষ'। সঙ্গীতের বেশ কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, শিল্প সঙ্গীত, আঞ্চলিক সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে আসা সঙ্গীত দুটি বিভাগে বিভক্ত — আঞ্চলিক সঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত। গ্রামাঞ্চলে লোকসঙ্গীতের চর্চা হয়। সকল সঙ্গীত বিভাগের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। লোকসঙ্গীতের নিজস্ব একটি শক্তিশালী স্বাক্ষর রয়েছে। এটি তার উপভাষা, সুর, আবেগ এবং গল্পের ভিত্তিতে আলাদা হয়।

আমরা যে লোকগান শুনি তার বেশিরভাগই গ্রাম বাংলার মানুষেরা তাদের দৈনন্দিন কাজের সময় গেয়ে থাকেন। কৃষক মাঠে চাষ করার সময়, জেলেরা মাছ ধরার সময়, মাঝিরা নৌকা বাওয়ার সময় কাজের সমন্বয় সাধন এবং তাল প্রকাশের জন্য ছন্দ ও সুর ব্যবহার করতেন। মিশর, গ্রীস, মেসোপটেমিয়া এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে লোক ঐতিহ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে সঙ্গীত বেশিরভাগ সময় ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপে ভূমিকা পালন করত।

উনবিংশ ও বিংশ শতকে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে বাংলা লোকসঙ্গীতের ওপর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। গ্রাম বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ শহরে চলে যায়, ফলে বাংলার লোকসঙ্গীতের সাথে অন্যান্য সঙ্গীত শৈলীর মিশ্রণ ঘটে। লোকসঙ্গীতের মতো পুনরুজ্জীবন আন্দোলনগুলি আধুনিক শ্রোতাদের কাছে লোকসঙ্গীত সংরক্ষণ এবং জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা

• লোকসঙ্গীত লোকমানস থেকে উদ্ভূত, যা সাধারণত শ্রুতি ও স্মৃতিকে নির্ভর করে বহমান থাকে। প্রাচীন নাথগীতি থেকে শুরু করে বর্তমান কালের বাউল, মরমিয়া ও দেহতত্ত্ব গানের রচয়িতাদের নাম-ভনিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাটিয়ালি ব্যক্তিচেতনাজাত একক কণ্ঠের গান হলেও ক্রমে তা লোকমুখে প্রচারিত হয়ে সমাজমানসে উত্তীর্ণ হয়।

• লোকসঙ্গীত ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট। শ্রুতি পরম্পরায় প্রচারিত এই সঙ্গীতের সুর, ভাষা সংক্রান্ত কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। বাঙালির সহজাত ক্ষমতা থেকেই এই গানের উৎপত্তি।

• সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকসঙ্গীতও পরিবর্তিত হয়। তবে এতে অতীত ইতিহাসও অনেক সময় আত্মরক্ষা করে।

• বাংলা লোকসঙ্গীত ঐতিহ্যপূর্ণ ও বৈচিত্রময়। পল্লীবাংলার মানুষের সংস্কারজাত চিন্তা-ভাবনা, তাদের বারো মাসে তেরো পাবনের উৎসব, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ, বাংলার প্রকৃতি ও নিসর্গশোভা, সমাজের অন্যায়-অত্যাচার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়বোধ ও অলৌকিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলার মানুষ এই গান বেঁধেছে।

• নাচ, গান ও বাদ্যযন্ত্র — এই তিনের সমন্বিত রূপ হলো সঙ্গীত। এদিক থেকে লোকগীতি, লোকবাদ্য ও লোকনৃত্য — এই তিনের সমন্বিত রূপকেই লোকসঙ্গীত বলা যায়। বাউল সঙ্গীত লোকসঙ্গীতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

• লোকগীতি কাহিনীধর্মী নয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে অসংলগ্নভাবে লোকগীতিতে লক্ষিত হয় কাহিনী বর্ণনা। সমাজচিত্র, অনেক সময় অজানা সমাজে, প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুভব সূত্রে এতে প্রকাশিত হয়।

• নদীমাতৃক বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালি সুরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় চরিত্র যেমন তার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, তেমনি লোকসঙ্গীতও প্রধানত দেশের প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশের প্রকৃতি সব জায়গায় সমান নয়; কোথাও নদীবিধৌত, কোথাও নিরস প্রস্তর ভূমি, কোথাও তরাই অঞ্চল, আবার কোথাও বা জঙ্গলাকীর্ণ। এই সমস্ত কারণে লোকসঙ্গীতের সুর সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করলেও তা প্রধানত আঞ্চলিক।

• লোকসঙ্গীত এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। সময়ের সাথে সাথে এটি বিকশিত হয়, নতুন প্রভাবের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং এর মূল পরিচয় অক্ষুন্ন থাকে।

• লোকসঙ্গীতের ভিত্তি প্রায়শই গল্প বলা। এর মধ্যে কিংবদন্তি, ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা নৈতিক শিক্ষার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে — যেমন- ব্যালাড, কাওয়ালী গানে পাওয়া যায়।

• লোকসঙ্গীত সহজাতভাবে অংশগ্রহণ মূলক। প্রায়শই সমাবেশ উৎসব বা অনুষ্ঠানে এই গান পরিবেশিত হয়। এটি তার শ্রোতা ও শিল্পীদের মধ্যে একাত্মতা ও অনুভূতি তৈরি করে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যে উৎসাহিত করে।

বিভিন্ন প্রকার লোকসঙ্গীত

• **বাউল** — লোকসঙ্গীতের এক বিশেষ পর্যায় হল বাউল গান। বাউল শব্দটি 'বাতুল' বা 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ ঈশ্বর প্রেমে পাগল। বাউল গান সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের রূপক আশ্রয়ী। তবে আবেগ, দরদ ও প্রকাশের সারল্যে এই গান অবাধে গুণান্বিত। রূপক আশ্রয়ী তত্ত্বানিষ্ঠা ও ভক্তিবিশ্বাসের আড়ালে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতিতুচ্ছ ঘটনাও অব্যর্থ স্থান করে নিয়েছে। বাউল গান গাওয়ার ভঙ্গি এবং এর গীতি বৈচিত্র্যও সম্পূর্ণ আলাদা।

বাউলদের পথ সহজিয়া সাধনার পথ। সমাজের গতানুগতিকতার মধ্যে তাঁরা আবদ্ধ নন। সমাজ জীবনের চিরাচরিত ধারার বাইরে গিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে এদের অবস্থান। বাউলদের সাধনার লক্ষ্য মানুষের মনের সন্ধান। তাই লালন ফকির গেয়েছেন —

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
ও এক পড়শি বসত করে।

এই ধর্ম সাধনার মধ্যে একটা সমন্বয়ী সুর রয়েছে। লালনের মনের আক্ষেপ, তাঁর প্রতিবেশী হওয়ার পরেও একদিনও তার সাক্ষাৎ না পাওয়া।

আধুনিক সাহিত্যের মূল বাণী হলো মানবতাবাদ। অথচ মধ্যযুগের সমাজে মানুষ ছিল দেবতার অধীন, তাদের জীবন ছিল দীর্ঘদিনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধ জলাভূমির মতো। সেই বদ্ধ জমিতে মানবজমিন আবাদ করার কোনো উপায় ছিল না। অনাবাদী জমি যেমন বন্ধ্যা হয়ে যায়, তেমনি মানবজমিনও আবাদের অভাবে আবদ্ধ হয়েছিল সামাজিক জড়তায়।

এমন মানব জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

এই জড়তা ধর্মে, বিশ্বাসে, সংস্কারে এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত। বাউল সাধকরা তাই সেই বদ্ধ জলাভূমিতে ফল ফলাবার সাধনায় ব্রতী হলেন।

বাউল গানের উদ্ভবের পটভূমিতে রয়েছে চর্যাপদের সময় থেকে চৈতন্যদেবের পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক ধারার ক্রমবিস্তারী প্রভাব। অন্যদিকে সমাজে সুফি ধর্মের আদর্শ সামাজিক সমন্বয়ের পথকে প্রশস্ত করলো। এই পটভূমিকায় বাউল সাধনার মূল কথাগুলি মানুষের হৃদয় দ্বারে আঘাত করলো, উদ্ভব হলো বাউল গানের।

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কিরূপ দেখলাম না এই নজরে।।

• **ভাটিয়ালি** — নদীমাতৃক বাংলাদেশে জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের একটি ধারা ভাটিয়ালি। 'ভাটিয়ালি' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে বাংলা 'ভাটা' শব্দ থেকে, যার অর্থ

নদী বা সমুদ্রের ভাটার টান। সাধারণত মাঝি মাল্লারা নদীপথে নৌকা চালানোর সময় ভাটিয়ালি গান গায়। এটি একক সঙ্গীত। প্রেম ও ঈশ্বর এই গানের প্রধান বিষয়। এতে একদিকে আছে লৌকিক প্রেম চেতনা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চেতনা।

বিষয় ও অবস্থাভেদে ভাটিয়ালি গানের শ্রেণি বিভাগ রয়েছে। এক সময় বাংলাদেশে এর পাঁচটি ধারা প্রচলিত থাকলেও এখন মূলত মুর্শিদি ও বিচ্ছেদী নামে পরিচিত দুই ধারার গানের প্রচলন রয়েছে। বাংলা লোকনাট্যে, বিশেষত গাজীর গানের বহু জায়গায় ভাটিয়ালির দুই-একটি ধারার পরিচয় মেলে।

বহু হৃদয়গ্রাহী ভাটিয়ালি গান রচিত হয়েছে এই বাংলায়। সময়ে বহমানতায় জনপ্রিয়তার সাথে চলেছে এই ধারা। বহু খ্যাতনামা কবি ও ব্যক্তি এই গানের অঙ্গনে যুক্ত। তাঁদের রচিত ও সংগৃহীত গানে এই ধারার মৌলিক রূপ নির্মিত হয়।

• **কীর্তন** — বাংলা সঙ্গীতের আদিতম ধারা কীর্তন। সাধারণ মানুষের ঈশ্বর সাধনার সহজতম পন্থা হল এই গান। গানের মাধ্যমে ঈশ্বর সাধনা — এই ধারা চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। সেই ধারায় বাংলার বৈষ্ণব ধর্মজাত সঙ্গীতধারার বিকশিত রূপ এই কীর্তন। ঈশ্বর সাধনার ধারা হিসাবে এই গানে ঈশ্বরের গুণাবলী ও লীলা বর্ণিত হয়। কীর্তনগানের আদি উৎস হিসাবে ধরা হয় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-কে। এখানে বিভিন্ন রাগ ও তালের উল্লেখ রয়েছে। এই সঙ্গীতধারার বিকাশ ঘটে বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য থেকেই। এই সময়ের কাছাকাছি মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও ব্রজবুলিতে কীর্তনাঙ্গের বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। পঞ্চদশ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে কীর্তনগানে অসামান্য বেগ সঞ্চারিত হয়। তিনি ছিলেন নামকীর্তনের প্রচারক।

বাংলা লোকসঙ্গীত ও ভক্তিগীতির এক অনন্য ধারা কীর্তন, যা রাধাকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা ও গুণাবলী নিয়ে রচিত। খোল-করতাল সহযোগে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া এই গানগুলিতে মূলত প্রেম, ভক্তি ও ঈশ্বর সাধনার প্রতীক। কীর্তনের এই ধারা দুটি ভাগে বিভক্ত — নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। ভগবানের নাম বারবার উচ্চারণ করা বা কীর্তন করা নামকীর্তন হিসাবে বিবেচিত। আর লীলাকীর্তনে রাধাকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বা প্রেমলীলা বর্ণনা করা হয়।

কীর্তন গান শুধু বিনোদন নয়, এটি সাধনার অন্যতম এক ধারা। এতে ভক্তি, প্রেম ও আত্ম নিবেদনের সুর থাকে। বাংলার সংস্কৃতিতে কীর্তনের গুরুত্ব অসীম। এই গান মানুষের মধ্যে ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যতা স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলার সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিতে এই গান যুগের পর যুগ ধরে মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে।

• **ঝুমুর** — ঝুমুর গান বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শৈলী। এই গান প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে গাওয়া হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁওতাল ছেলে মেয়েরা বনফুলে সেজে মাদলের সঙ্গে দল বেঁধে নাচের তালে তালে এই গান গেয়ে থাকে। শাল-পিয়াল মহুয়া বনের মিষ্টি সুরে মাদলের তালে আদিবাসীদের প্রচলিত এই সঙ্গীত হল ঝুমুর গান।

ঝুমুর গানে সাধারণত দ্রুত ছন্দ এবং সহজ সুর থাকে, যা শুনতে খুবই আনন্দদায়ক। এই গানের বিষয়বস্তু সাধারণত গ্রামীণ জীবন, প্রেম, প্রকৃতি এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে থাকে। ঝুমুর গান গায়কের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের আবেগ প্রকাশিত হয়, যা শ্রোতাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এই গান সাধারণত নাচের সাথে পরিবেশন করা হয়, যার ফলে গানের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

এই গান বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান; যেমন- বিয়ে, পুজো বা অন্য কোনো উৎসবে গাওয়া হয়। গানগুলি শুধু বিনোদনই নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে। ঝুমুর গান বর্তমানে আধুনিক সঙ্গীতের সাথে মিশে নতুন রূপ নিচ্ছে। অনেক শিল্পী এই ধারাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছেন। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই গান। এটি আমাদের গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্য ও সাদৃশ্যকে তুলে ধরে।

• **কবিগান** — কবিগান বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি মূলত কবি বা গায়কদের দ্বারা গাওয়া হয়। কবিগান সাধারণত একক গায়ক বা গায়িকাদের দ্বারা পরিবেশিত হয়। কবিগানের উৎপত্তি বাংলার গ্রামীণ সমাজে যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনের নানা দিক তুলে ধরার জন্য কবিরা গান রচনা করতেন। এটি মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মে স্থানীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে।

কবিগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে ঢোল, মন্দিরা, একতারা এবং বাঁশি অন্যতম। এসব বাদ্যযন্ত্রের সুর কবিগানের আবেগকে আরও উজ্জীবিত করে। কবিগান সাধারণত শিক্ষামূলক উপাদান নিয়ে গঠিত হয়। এতে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত কবি গায়ক রয়েছেন, যারা তাদের গান দিয়ে সমাজে পরিবর্তন এনেছেন। শাহ আব্দুল করিম, লালন শাহ এবং হাছন রাজা প্রমুখ গানের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন।

• **ভাওয়াইয়া** — একটি বহুল প্রচলিত লোকসঙ্গীত হলো ভাওয়াইয়া গান। উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এই গান প্রচলিত। ভাওয়াইয়া গানের আকরভূমি রংপুর। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নদী-নালা কম থাকায় গরুর গাড়িতে চলাচলের প্রচলন ছিল। গরুর গাড়ির গারোয়ান রাত্রে গাড়ি চালানোর সময় বিরহ ভাবাবেগে কাতর হয়ে আপন মনে গান ধরে। উঁচু-নীচু রাস্তায় গাড়ির চাকা পড়লে তার গানের সুরে কিছুটা ভাঁজ পড়তো। এই রকম সুরে ভাঙা বা ভাঁজ পড়া গানের রীতিই ভাওয়াইয়া গানের লক্ষ্যণীয় বিষয়। ভাওয়াইয়া গানে অনেকটা ভাটিয়ালি সুরের ছাপ থাকলেও ছন্দ ও গায়ন ভঙ্গীতে যথেস্ট পার্থক্য রয়েছে। ভাটিয়ালি অনেকটা পুরুষ প্রধান গান, ভাওয়াইয়া সেদিক থেকে নারী প্রধান গান। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই গান গেয়ে থাকেন। এই গানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো দোতরা।

• **বোলান** — বাংলার গাজন উৎসবের ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত বোলান গান, যা মূলত শিবের বন্দনায় গাওয়া হয়। শিল্পীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে শিব-পার্বতীর গীতি কাহিনী পরিবেশন করেন। গাজনের সময় পৌরাণিক বা সামাজিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে এই দীর্ঘ গীতি-নাটক পরিবেশিত করেন। শ্মশান জীবন এবং শিবের ভৈরব রূপ নিয়ে পরিবেশিত উত্তেজনা ও আদিরসাত্মক হয় এই গান। পৌরাণিক বোলানে দেখা যায়, লক্ষণের অচেতন হওয়ার কাহিনী। সমাজের বিভিন্ন দিক এই গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

বন্দনাগীতির মাধ্যমে বোলান গান শুরু হয় এবং পরে পাঁচালির ঢঙে মূল পালা গাওয়া হয়। গানের পর সংলাপ ও উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কিছু তত্ত্বকথা ব্যক্ত করা হয় এবং শেষে থাকে লঘু রসের পাঁচালি। এই অংশে নাচ-গানেরও আয়োজন করা হয় দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। বোলান গানের শিল্পীরা অপেশাদার হয়। যুগের পরিবর্তন এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বোলান গান ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

• **ঝাপান** — ঝাপান গান বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যবাহী অংশ, যা মূলত মনসার পুজোকে কেন্দ্র করে সাপুড়ে বা ওঝাদের দ্বারা গাওয়া হয়। শ্রাবণ

মাসের সংক্রান্তিতে বা মনসা পুজোর সময় সাপুড়েরা বিভিন্ন প্রজাতির সাপ নিয়ে যখন উৎসব পালন করে, সেই সময় ঢাক ও বাঁশির তালে সাপের খেলা দেখিয়ে এই গান গাওয়া হয়।

• **টুসু** — টুসু গান মূলত 'টুসু' নামে পরিচিত একটি উৎসবের সাথে যুক্ত যা সাধারণত পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে কৃষকরা তাদের ধান কাটার পর আনন্দ উদযাপন করে এবং নতুন ফসলের জন্য প্রার্থনা করে। এই গানে প্রধানত প্রেম, প্রকৃতি, কৃষিজীবন এবং সামাজিক সম্পর্কের কথা বলা হয়। এতে স্থানীয় লোকসংস্কৃতির উপাদানও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এই গান সাধারণত স্থানীয় গায়ক ও গায়িকাদের দ্বারা দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করা হয়, যেখানে সবাই একসাথে অংশগ্রহণ করে। টুসু গানের মধ্যে দিয়ে সমাজে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এটি স্থানীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই গানের মধ্যে দিয়ে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও বন্ধন সৃষ্টি হয়।

• **ভাদু** — বাংলায় জনপ্রিয় লোকগানের মধ্যে ভাদু গান অন্যতম। প্রধানত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলার আসানসোল, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলায় এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। জনপ্রিয় এই ভাদু গানের সাথে পঞ্চকোট রাজপরিবারের কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে।

লৌকিক কাহিনী অনুসারে, এই রাজপরিবারের রাজা নীলমণি সিংহদেও-এর কন্যারূপে ভদ্রাবতী বা ভাদুকে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভদ্রাবতীর জীবনের করুন কাহিনীর মধ্যেই ভাদু গানের জন্ম। রাঢ় বাংলার কুমারী মেয়েরা এই গানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত এই উৎসব চলে। ভাদ্র সংক্রান্তির আগের রাতকে বলা হয় ভাদুর জাগরণ, অর্থাৎ সারারাত ধরে চলে উৎসব। এই গানকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যতা গড়ে ওঠে। ভাদু গানের মধ্যেই গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন-জীবিকা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ফুটে ওঠে। বাংলার মাঠ-ঘাট, চাষীদের ফসল ফলানো, ফসল ঘরে তোলা এবং তাকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন — এ সবই গানের মধ্যে ফুটে ওঠে। ভাদু গায়করা তাদের আনন্দ, অনুভূতিগুলিকে গানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলে পাঠক বা শ্রোতার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কাহিনী সমৃদ্ধ এই গান বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

• **যাত্রাগান** — ভারতের এক বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন গান। এই গান সাধারণত রাম-সীতা, রাধাকৃষ্ণ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পালাগান হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। যাত্রাগানে সাধারণত নাচ-গানের সংলাপের সাথে মিশে থাকে। প্রেম, বেদনা, ভক্তি বা বীরত্ব — সবই এখানে অতিরঞ্জিতভাবে দেখানো হয়। খোলা মঞ্চে দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কণ্ঠস্বর জোরালো রাখতে হয়। ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এই গান গাওয়া হয়।

যাত্রার উৎপত্তি মধ্যযুগে, বিশেষ করে বৈষ্ণব আন্দোলনের সময়। ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে ভক্তিমূলক গান ও নাট্যরূপ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এটি লোকনাট্যের একটি স্বতন্ত্র ধারায় পরিণত হয়। বর্তমানে যাত্রাগানে আধুনিক বিষয়বস্তু যুক্ত হয়েছে। রাজনীতি, সামাজিক অবিচার, এমনকি সিনেমার প্রভাবও লক্ষ্য করা হয়। যাত্রাগান বাংলার সংস্কৃতির একটি জীবন্ত ঐতিহ্য, যা যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত হলেও তার মূল রূপ ও আবেগ এখনও অটুট আছে।

উপসংহার — লোকসঙ্গীত গ্রামীণ বাংলার আত্মিক সুর। এটি কেবল অতীতের স্মৃতিই নয়, বরং বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জীবন প্রতীক, যা সবসময় আমাদের মাটির কাছাকাছি রাখে। এই গান বাংলার মাটি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য জীবনদর্শন, সুখ-দুঃখ এবং সংস্কৃতির ধারক। যুগ যুগ ধরে প্রবহমান এই গান সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ও স্মৃতি নির্ভর হয়ে টিকে থাকে, যা বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদির মতো বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত। এটি কেবল বিনোদন নয়, বরং আত্মিক অন্বেষণ ও সামাজিক বাস্তবতার এক প্রামাণ্য দলিল।

"বন্ধুরে অকূলে ভাসাইয়া
বন্ধু কই রইলা রে,
লহর দরিয়ার বুকে,
মইলাম সাঁতারিয়া হা!
কি দুঃখ বুঝিবে বন্ধুরে,
কিনারায় দাঁড়াইয়া...
বন্ধু কই রইলা রে।"

Bibliography

- ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য ১ ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ — ১৯৫৬।
- চক্রবর্তী, ড: বরুণকুমার, লোক-সংস্কৃতি: নানা প্রসঙ্গ, বুক ট্রাস্ট, প্রথম প্রকাশ—১৯৮০।
- ভট্টাচার্য, তরুন দেব, পুরুলিয়া, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ — ১৯৮৬।
- পাল, অনিমেষ কান্তি, লোক সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ — ১৯৯৬।
- মিশ্র, দেবতুমি, লোকসংস্কৃতির রূপ ও স্বরূপ, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ — ২০১০।
- গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ, লোকসঙ্গীত বিভাকর, প্রথম খন্ড, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ — ১৯৯৮।
- মাইতি, ড. চিত্তরঞ্জন, বাংলা লোকসঙ্গীতে লোকজোত ও লোকমানস, বুকফ্রেন্ড, প্রথম প্রকাশ — রাস পূর্ণিমা, ১৩৯৯।
- সিংহ, ড. শান্তি, লোকসঙ্গীত সংগ্রহ: ঝুমুর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ — ১৯৯৯।